ওঁতৎসৎ।

হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী—২০

শান্তি।

আদিব্রাহ্মসমাজের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার
সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্বনিধি, বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত।

[মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

কলিকাতা

৫৫ আপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

এবং

৫০২৪ কলিগতাব্দে ১৯৮০ সম্বতে ১৮৪৫ শকে

১৩৩০ সালে ৯৪ ব্রাহ্ম সম্বতে কন্যারাশিস্থ

ভাস্করে আশ্বিন মাসে চতুর্থ দিবসে

শুক্রবাসরে শুক্লপক্ষে শুভ

বামন-দ্বাদশী তিথিতে

প্রকাশিত

হইল।

পূজ্যপাদ অগ্রজ ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

দেশে বিদেশে সংসারের দুঃখশোকে কণ্টকের আঘাতে অন্তস্তল যখন ক্ষতবিক্ষত হইবার উপক্রম হইত, অশান্তি যখন মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিবার উপক্রম করিত, তখন এই সকল কবিতা লিখিয়া প্রাণে শান্তি লাভ করিয়াছি। তাই ইহার নাম "শান্তি" দিয়াছি। এই কারণে, বলা বাহুল্য, এই সকল কবিতার অধিকাংশ প্রাণের আরামস্থল ভগবানের উদ্দেশ্যেই লিখিত। সংসারের কঠিন আঘাতে আমার মত যাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কেহ যদি এই গ্রন্থের কোন কবিতায় এতটুকু শান্তি পান, তাহা হইলেই আামার এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইবে।

৬।১ বি, বারাণসী ঘোষের
সেকেণ্ড লেন যোড়াসাঁকো
কলিকাতা।
১৩৩০, ৪ঠা আশ্বিন;
১৯২৩, ২১ সেপ্টেম্বর
শুক্রবার।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র।

কবিতাসূচী।

সংখ্যা	বিষয়	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা

শাস্তি

শান্তি।

১। নববর্ষে।

মিশ্র রামকেলী—তাল দাদ্‌রা।

জাগো সবে জাগো আজি পুণ্য দিনে
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে ॥

পুষ্প ফোটে পাখী জাগে—
ছুটে চলি' সবার আগে—
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে ॥

শান্তি-

সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে,
দিকে দিকে ঘণ্টা বাজে ;—
যেথা যে বা, সবে চলি'
তাঁরি জয়ধ্বনি করি'
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে ॥

রাঙ্গাইয়া গগন-থালে
উঠছে ভানু তালে তালে—
মন আর যে রইতে নারে
ঘরের কোণের আঁধারে ।

এমন মধুর সকাল-বেলা
কোরো নাকো বৃথা খেলা ;—
গীতে গন্ধে সভার মাঝে
প্রাণের দেবতা দেখবে রাজে—
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে ॥

—৩—

২। নূতন।

নূতন জগত খুলে গেছে আজ
আমার চোখের আগে ;
অরুণ আলোকে প্রভাত-পুলকে
আমার পরাণ জাগে ॥

মাতাল প্রভাতে মাতাল বাতাস
পরাণ মাতাল ক'রে,
দিশাহীন প্রাণে সীমাহীন দেশে
বহিছে পরাণ ভ'রে ॥

শান্তি—

নূতন আকাশে নূতন বাতাসে
আমিও বেড়াই ছুটে ;—
যত কিছু বাধা, যত কিছু আঁধা
সকলি গিয়েছে টুটে ॥

নূতন গাছের নূতন শাখায়
নূতন ফুলের বাসে
গায় শত পাখী হর্ষে মাখামাখি
শত তান শত ভাষে ॥

নূতনের তত্ত্ব, আনন্দের তথ্য
কে তুমি জানিতে চাও ?
এস তবে পাশে যৌবনের আশে
বারেক দাঁড়ায়ে যাও ॥

দেখিবে হেথায় আপন ব্যথায়
মরে আছে নিরানন্দ ;
আনন্দের মন্ত্রে যৌবনের কেন্দ্রে
ভেসে গেছে যত দ্বন্দ্ব ॥

বৃদ্ধ, নারী, নব যুবা—
দুর্বল সবল কেবা—
দুঃখ দৈন্য ভেঙ্গে চুরে,
আনন্দে হৃদয় পুরে,
গাও সবে পৃথ্বী জুড়ে
আকাশ-ফাটানো সুরে—
জয় সত্য সনাতন—
চির নবীনের জয় ;
জয় আনন্দ অক্ষয়—
চির সুন্দরের জয় ।

৬। প্রভাতে।

মিশ্র রামকেলী—তাল দাদরা।

রক্ত রবি উঠ্‌ল গগন ভ'রে—
বাহির হওরে এবার কাজের স্রোতে॥

ঘুমের ঘোর সব ভেঙ্গে দিয়ে
তাঁরি পুণ্য নামটী নিয়ে—
বাহির হওরে এবার কাজের স্রোতে॥

ভরসা আশা যত কিছু
তাঁরি পায়ে নিবেদিয়ে
একমনে তাঁর চরণ ধরে
ভক্তিজলে ধৌত হিয়ে—
বাহির হওরে এবার কাজের স্রোতে॥

গাছে গাছে পাখী যত
গীত শত উঠছে গেয়ে ;
তাদের গানে পুষ্প শত
গাছে গাছে ফুটছে ছেয়ে।

এমন বিমল সকালবেলা
কাটায়ো না অবহেলে ;
ফুলের পাখীর আনন্দেতে
আপন প্রাণে মিশাইয়ে—
বাহির হওরে এবার কাজের স্রোতে

৪। তব নাম।

প্রাণের গভীর হতে
উঠিতেছে গান ;—
দিবানিশি শুনি তাহে
বাজে তব নাম ॥

সবল ঝঙ্কার তায়—
অনাহত ধ্বনি।
গগন ভরিয়া তাহে
উঠে প্রতিধ্বনি ॥

তোমা ছাড়া কারো নামে
পারিব না কভু
হৃদয়ের পূজা দিতে
এ জীবনে প্রভু ॥

আমার প্রাণের কথা
তুমি জান একা।
মরমে কেমন সদা
চাহি তব দেখা॥

যে গান উঠিছে প্রাণে—
তা-ও দেছ তুমি।
তাই দিয়ে পূজি' তোমা—
তব পদে নমি॥

বুঝেছি জেনেছি পিতা!
সঙ্গীত আমার
পশেছে শ্রবণে তব—
আনন্দ অপার!

শান্তি—

নবীনেরে ভালবাসা—
শুধুই মুখের কথা—
তোমা পরে নাহি যদি
মরমের রহে ব্যথা ॥

আমি যে গাহিছি আজ
নব অধিকার লয়ে—
তুমি প্রাণে আছ ব'লে
মূর্ত্ত ইতিহাস হয়ে ॥

মানবসমাজ যাহা
শত যুগে রচিয়াছে
কর্ম্মমাল্য—তারি গাথা
তব প্রাণে গাঁথা আছে ॥

হে পুরাতন ! সে গান
পায় না ধরিতে প্রাণে ;-
ফুটিয়া বাহির হয়
পূরবী-বিষাদ তানে ॥

তারি মাঝে যোগ আমি
দেখি নবীনের সনে।
বিভাস ভৈরবী শত
নব তান জাগে মনে ॥

জাগাইতে চাহি তাই
প্রতি নরনারী-প্রাণে—
প্রাচীন-নবীন-যোগে
আনন্দের নব গানে ॥

—ওঁ—

৮। ভিক্ষা।

গান্ধারী তোড়ী—তাল তেতালা।

তব পদে লভি' চিতে
উঠে মুঞ্জরিয়া
গীতি শত নব রাগে।

তব হাসি ফুটুক
করিয়া মম
সরম-বনে সুরভিত—
তব পদে এই ভিক্ষা জাগে॥

—ওঁ—

৭। চতুর্ব্বর্গ।

হে ভগবান—

জয়রব তব উঠুক ধ্বনিয়া।

নিদ্রায় কাতর যবে

জীবজন্তু যত সবে,

তোমারি আশীষকণ

নামিয়া শিশির সম

দেয় নূতন জীবন—

নব শক্তি সঞ্জীবন।

জয়ধ্বনি হোক আকাশ ভরিয়া॥

মরণের পরপারে কর্ম্মশেষে

যবে উঠিব জাগিয়া,

তখন তোমারি আলো

বিশুভ্র সুন্দর ভালো

হৃদয় যেন ভরিয়া

জাগিতে আমারে দেয় হেসে হেসে।

শান্তি—

তোমারে নিকটে যদি
নাহি পাই প্রভু।
তোমারি মহিমা যদি
নাহি গাই কভু—
ধিক সে জীবনে—মোর সে জীবন
মরণ-সমান!
চাহি না স্বরগে—মোর সে স্বরগ
নরক-সমান!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যত কিছু—
আমার নয়নে
সকলি সমান—
সম্মুখে বিরাজে
বিরাট শ্মশান!
যেথায় রহিবে তুমি, সেথা মোর স্বর্গ;
তোমারে পাইলে মোর সিদ্ধ চতুর্বর্গ॥

—ওঁ—

৮। নীরব রাতে।

বেহাগ শঙ্করা—তাল তেওরা।

তোমার ভাতি
নীরব রাতে
বিছানো আছে
গগন-মাঝে।

মেঘেরা ভেসে
চলিছে হেসে
কে জানে কোন্
অজানা দেশে।

জোছনা খেলে
মেঘের কোলে
দেখিয়া, গানে
জাগিছে প্রাণে।

কাটাব আমি
সারাটী যামি
উরধ মুখে
পরম সুখে ;

ধরণী ছেড়ে
বেড়াব খেলে
মেঘের সনে
পাগল মনে।

ফুলের পুটে
সুবাস লুটে'
হরষে টুটে'
বাতাস ছুটে।

নীরব রাতে—

তোমারে ঘেরি'
তারকা সারি
দিতেছে বলি
চরণে ঢালি ॥

৯। তাঁর বাণী।

নীরব সন্ধ্যায় শোন
নামে তাঁর বাণী।
অনুপম শান্তি দেয়
চিত্তমাঝে আনি' ॥

সন্ধ্যার শিশির সম
ধীরে—অতিধীরে,
অনাহত বাণী তাঁর
সিক্ত করে শিরে ॥

প্রতিধ্বনি জাগে শোন
মধুর তাহার,
মহাশূন্য হতে ফিরি'
অন্তরে সবার ॥

আনন্দ-বেপথু উঠে
জগতের মাঝে ;
প্রাণের বাতাসে নব
হৃদিপদ্ম নাচে ॥

মলয়বাতাসে কত
সঙ্গীতের সুরে
ভেসে আসে তাঁরি বাণী
হৃদয়ের পুরে ॥

প্রভাতে অরুণকর
তপনের সাথে
জ্যোতির্ম্ময় রূপে তাহা
নয়নেতে ভাতে

শান্তি—

আলো ছায়া যেথা যাহা,
সকলের মাঝে
এক শুধু তাঁর বাণী
সদা জেগে আছে ॥

হে দেব ! হে পিতা ! রাখ
হৃদয়ে সবার
প্রেমের ঐ বাণী সদা
জাগায়ে তোমার ॥

দূর কর সংসারের
দুঃখ জ্বালা শত।
প্রণমি তোমারে মোরা
মাথা করি নত ॥

১০। জাগো।

আজি নিরমল প্রভাততপনে
জাগো ওরে জাগো।
ছেড়ে দিয়ে অচৈতন্য
দূর করি' দুঃখ দৈন্য,
তাঁরি শুভ নাম লয়ে
বীরের হৃদয় লয়ে
শুভ কর্ম্মে লাগো—
জাগো ওরে জাগো॥

মঙ্গল তাঁহার আশীষ ঝরিবে,
সুগন্ধ ফুলের পরাগ বহিবে;
থেকো না থেকো না নিদ্রামগ্ন আর
ডুবি' আলস্য-স্বপনে
ভুলি' ধরমে করমে;

উঠে পড়—
আগে চল—
ভালমন্দ সবি সঁপি পদে তাঁর ;
সকলের আগে চল—
চল ওরে চল ॥

অতীতে করেছ জানি ওগো জানি
অনেক অমূল্য সময়েরে ব্যর্থ ;
পদে পদে ভুল করি' ওগো মানি
জগতে এনেছ অনেক অনর্থ ;
ভুলে যাও তাহা—
ছাড় করা হা-হা ।
এখন অবধি
কাজে নিরবধি

লাগি' প্রাণপণে জীবনে অর্থ
করো ওগো কর;
শুভ কর্ম্ম যত
ধর ওগো ধর॥

জ্ঞানে বড় হও,
ধর্ম্মে বড় হও;
করমে ফুটায়ে তোল—
প্রাণের আঁধার
নিরুদ্ধ দুয়ার
খোল ওগো খোল;
আর কিছু যত
বাজে কথা শত
তোল ওগো তোল॥

শান্তি—

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো,

ফুটুক উজ্জল আলো।

সোজা পথে চলে যাও—

কাহারে কোরো না ভয়—

সম্মুখে রয়েছে জয়।

কেবা আছে

পড়ি' পাছে,

তার দিকে চেয়ো নাকো—

সম্মুখেতে দৃষ্টি রাখো।

জয়লাভ যদি চাও—

শুভ কর্ম্মে লাগো—

জাগো ওরে জাগো ॥

—ওঁ—

১১। দয়া।

গান্ধারী তোড়ী—তাল তেতালা।

তোমা হারাইয়া
প্রাণ গেছে শুকাইয়া—
গান যে নাহি উঠে জাগি'।
নামে তব উঠুক বাজিয়া পুনঃ
মরমবীণা দিনরাতি—
প্রভু তব হে দয়া মাগি॥

১২। আনন্দ-রহো।

সহজ কথাটা বটে আনন্দে নাচিতে;
সহজ কথাটা বটে হাসিতে খেলিতে;—
সহজে যখন যায় সময় চলিয়া,
মনের মতন সব ঘটনা ঘটিয়া॥

কঠিন কথা রে হায় আনন্দিত চিতে
নিয়মেতে ধরা দিয়ে কাজ করে যেতে—
সকলি যখন যায় বিরুদ্ধে আমার,—
দিনের আলোক গিয়ে আসে গো আঁধার॥

আনন্দ রহো রে ভাই—যাবে কেটে মন্দ;
আঁধার কাটিবে—মনে রেখো নাকো দ্বন্দ্ব।
উঠুক ঝটিকা মেঘ যত কালো ঘোর,
প্রভাতে নামিবে জেনো আলোকের ঝোর॥

—৩—

১০। সফলতা।

সুদীর্ঘ—সুদীর্ঘ—পথ
এসেছি চলিয়া ;
জন্মিবার পূর্ব হতে
চলেছি জন্মিয়া—

ভারতের পুণ্যভূমে
জন্ম লব বলি',
প্রাণের আনন্দ-হাসি
বিতরিব বলি'—

ধর্ম্মের আলোক দীপ
সু-উচ্চে ধরিয়া,
অধর্ম্মের অন্ধকার
সমূলে নাশিয়া ॥

শান্তি—

দাঁড়ায়ে ধর্ম্মের পরে
ত্রিশকোটী যবে
ভারতসন্তান মিলে
একপ্রাণে সবে

করিবে আপন কাজ—
দূর করি' ভয়—
সফল আমার আশ,
তখনি হৃদয়
নাচিবে আনন্দে নিত্য
অনন্ত অক্ষয় ;
দিনরাত গাব—জয়
ভারতের জয় ॥

কিবা ছেলে কিবা মেয়ে—
জননীর জাতি—
জ্ঞানে ধর্ম্মে জেগে উঠি'
আনন্দের ভাতি
জাগায়ে তুলিবে যবে
প্রতি গেহে গেহে,
সবল হইবে সবে
প্রাণে মনে দেহে—
হইব সফলকাম
সেদিন ; সেদিন
ভারত সন্তান সবে
রবে নাকো আর

দুর্ব্বল নমিয়া মাথা
লাজে দীনহীন—
ক্রীতদাস যথা ভুলি'
নিজ অধিকার ॥

—৩—

১৪। গোপন-পূজা।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

পরাণ আমার
চাহে গো তোমার—
দেবতা প্রাণের হে !
আকুল বিরহে
দহিয়া হৃদয়ে
ডাকি প্রিয়তম হে !
মোর আঁখিজলে
পাষাণ যে গলে
তুমি যে টল না হে !
ভিজাই কেমনে
তোমারি মরমে
জানি না জানি না হে।

নাহি যদি লবে
প্রাণে টানি', তবে
    তব পদতলে হে
পড়িয়া রহিব
ভুলি' দুখ সব
    মুছি' আঁখিজলে হে!
তোমারি মূরতি
হিয়ার পরতে-
    পরতে আঁকিব হে—
ভকতি-কুসুম
করিয়া চয়ন
    গোপনে পূজিব হে॥

—ও—

১৮। জাগ আনন্দে।

বেহাগ—তেতালা।

পরাণ জাগরে—জাগ আনন্দে।
শোন—তারাগণ গায় কত ছন্দে॥
আঁখি খুলিয়া দেখ চেয়ে
কানন আজি পূর্ণ ফুলে গন্ধে॥

—ও—

১৬। ভজ ওঙ্কার।

(ঠাকুর লোচন দাসের অনুকরণে)

ভজ ওঙ্কার কহ ওঙ্কার
লহ ওঙ্কারের নাম রে।
যে জনা ওঙ্কার ভজে
সে-ই আমার প্রাণ রে॥

(ওরে) যেথা আছ যে রে ভাই
কহি পায়ে তব ধরি' রে।
আপনে বিকিয়ে দাও ভাই
ভজ নিরাকারে রে॥

অবাধ পরমানন্দ
নিত্যকাল পাও রে।
অভিমানশূন্য হিয়ায়
(ও ভাই) ধরাতে বেড়াও রে॥

এসেছেন প্রাণারাম
পায়ে পড়ি' যাও রে।
সোনার আসন ও ভাই
অশ্রুজলে ধুয়াও রে॥

বেড়াও ব্রহ্মনাম দিয়ে—
কলিজীবের দ্বারে দ্বারে
বেড়াও ব্রহ্ম নাম দিয়ে॥

ওরে গেলরে দিন চলে গেল—
ভজরে তাঁয়—ভজরে ভাই।
হেন ভগবানে যার
রতি না জন্মিল রে
ঠাকুর ক্ষিতীশ্র বলে,
সে-ই দুখী এল আর গেল—
যে সর্বপাপহরে ভজলো না রে॥

—ওঁ—

১৭। শোন।

প্রাণনাথ শোন তুমি
শোন মোর কথা—
থেকো না থেকো না দূরে
প্রাণে দিয়ে ব্যথা॥

ভকতজনের তব
দেখ বক্ষ চিরি'
তোমারি অঙ্কিত নাম—
তাই লয়ে ফিরি॥

জানি না তোমায় এত
কেন বাসি ভাল—
তুমিই আমার প্রাণ—
নয়নের আলো॥

শোন—

তুমি মম প্রাণবঁধু—
সকলি আমার !—
তোমারে ছাড়িয়া যাব
কোথা বল আর ?

তোমারে বাসিলে ভাল
এত দুঃখ আছে—
এ কথা বল নি কেন—
কেবা যেত কাছে ?

তবুও কি জানি কেন
তব নামে উঠে
হৃদয়কমল মম
হরষেতে ফুটে !

১৮। মন যাওরে অন্তঃপুরে।

ইমনপূরবী—তাল দাদ্‌রা।

শান্ত সন্ধ্যা এল আকাশ জুড়ে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে ॥

প্রাণ ভ'রে গো ডাক তাঁরে
সেই অকূলের কূলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে ॥

প্রাণের কথা যত কিছু
বল তাঁরে বল খুলে।
বেড়ায়ো না হেথা হোথা
মরি' বৃথা ঘুরে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।

মন যাওরে অন্তঃপুরে—

ভক্তিসিক্ত হয়ে তাঁরি
   দাঁড়াও চরণমূলে।
গন্ধে বর্ণে ফুটুক চিত্ত
   প্রেমের হাওয়ায় দুলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥

প্রিয়তম সখা তোমার
   নাইকো জেনো তিলেক দূরে।
দেখবে তিনি আছেন হৃদে—
   অশ্রুজলে ধুলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥

এমন মধুর সন্ধ্যাবেলা
   প্রেমভক্তি নানা ফুলে
চিত্তসাজি সাজাইয়া
   দাও গো তাঁরি পায়ে তুলে।

শান্তি—

ডাকবার মত ডাক তাঁরে
ব্যাকুল করুণ সুরে ;
দেখা দেবেন প্রাণের মাঝে
আপনারেও ভুলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে ॥

১৯। সাগর চেয়ে।

ভবের নায়ে আমি
চলেছি ভেসে
কোথা কোন্ অসীম
অজানা দেশে!

দুখের সুখের ঢেউ
হুহুঙ্কারে আসি'
দিতেছে প্রবল ধাক্কা
রোহে পাশাপাশি।

মাথার উপর দিয়ে
কখনো মলয় বায়
গাহিয়া আনন্দ-গীতি
ধীরে ধীরে বহে যায়।

শান্তি—

ঝড়ের বাতাস কভু
সহসা জাগিয়া উঠি'
ছোট মোর তরী চাহে
করে দিতে কুটি-কুটি।

হাল ধ'রে তুমি যবে—
ছোট হোক, তবু বড় ;-
ঢেউ কেটে চলে তাই—
বজ্র মাথে কড় কড়।

গ্রহতারা খেলা দেখে
নীরব আনন্দে চেয়ে।
আমিও ডরি না কারে—
শুধু চলি গান গেয়ে।

কে আছিস ডাঙ্গা-পরে
আয় তোরা চলে আয়!
মাতাল ঢেউয়ের সুখ
কে বুঝিবি চলে আয়!

মাতাল না খেয়ে মদ
হতে যদি চাস তোরা,
মাতাল ঢেউয়ের তবে
গানে তানে প্রাণ পোরা।

যুবক বালক নারী
কত কে যৌবন চাও?
অসীমের প্রাণে সবে
আপনে ঢালিয়ে দাও।

জরা-গ্রস্ত বৃদ্ধ কেবা—
আনন্দের কর সেবা ;
যুবক হইয়া যাও
যৌবনের বল পাও।

নীচে যে অসীম সিন্ধু,
মাথা'পরি মহা ব্যোম ;
অসীম যে আশে-পাশে
কর সবে তারি স্তোম।

চোখের সম্মুখে যত
বাধা সব ভেঙ্গে যাক ;
অসীম আনন্দ-দৃশ্য
খুলে যাক—খুলে যাক।

আনন্দের উলুধ্বনি,
উঠুক গগন ভরি'
তারি তালে নাচি শুধু
বলি' হরি হরি হরি।

—ওঁ—

২০। লহ লহ।

রাগিণী হাম্বীর—ঝাঁপতাল।

লহ লহ কোলে তুলে

মাগো জননি!

মরমব্যথা দূর করি দাও

মাগো জননি!

আঁধার বনেতে খেলিতে খেলিতে

লেগেছে শতেক কাঁটার আঘাতে;

দরদরধারে ঝরিছে শোণিতে

মুছাইয়া দাও—পারি না সহিতে—

মাগো জননি!

অঙ্গে অঙ্গে বাজে ব্যথা—

পারিনা কহিতে কথা;

বুকে তব থুয়ে মাথা

প্রাণ জুড়াও—জুড়াও—

মাগো জননি!

লহ লহ—

নাহি জেনে আমি কত করি দোষ ;
আমি শিশু অতি কোরো নাকো রোষ ;
তোমারি চরণে এসেছি পড়িয়া—
আর কভু দূরে যাব না চলিয়া—
মাগো জননি !

২১। বিদায়

হে সংসার! তোমার কাছে
আজি লইনু বিদায়॥
শুনিতে আর পারি নাকো
ছোটখাটো হায় হায়!

অনন্তের সাগরপানে
ভাসায়ে দিয়েছি তরী।
সব দিয়েছি ছেড়ে ছুড়ে—
হাল ধরেছেন হরি॥

কাঁদছ সবাই কেন গো
আকাশ জুড়িয়া আজ?
যেন কত পাপ করেছি—
কতই অন্যায় কাজ!

কেঁদে কেটে আর আমাকে
ডেকো না ডেকো না পিছে।
এতদিনে সব বুঝেছি—
সবি ফাঁকি—সবি মিছে॥

তবু আমি যাবার আগে
দিচ্ছি সবে আলিঙ্গন—
নিতে যদি হও গো রাজী
খুলে প্রাণ খুলে মন॥

—ওঁ—

২২। কোলে ডাকো।

রামপ্রসাদী সুর।

(ওমা) মা বলে আর
তোমা ডাকব নাকো।
আমায় ভুলে সুখ যদি পাও
আমায় সদা ভুলেই থাকো ॥

অপরাধ যদি করেই থাকি,
ঘাট মেনেছি শতেক নাকি ?
তবু তোমার একি ধারা—
আমায় সদা ভুলে থাকো ?

আদর ভিক্ষা করতে নারি ;
আমার ব্যথা (আমি) সইতে পারি।
(তোমার) নতুন ধারায় আদর করা
তুমি আপন কাছেই রাখো ॥

শান্তি—

শুনে যাও মা যেও না চলে ;—

ছেলে অমন কতই বলে !

অভিমান মা ছেড়ে দিনু

(এই)   বুকের পরে চরণ রাখো।

হৃদয়খানি জুড়িয়ে দিয়ে

বারেক তুমি কোলে ডাকো।

—ওঁ—

২৩। চরণপরশ ॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

হে প্রভু প্রাণে চরণপরশ দাও—

কি আনন্দ চিতে জাগে!

ভরি' দেহ মন চরণপরশ দাও!

শোক ম্লান জরা করি' দূর

হরষিত কর মোর হিয়া!

হে প্রভু প্রাণে চরণপরশ দাও!

—ঃ—

২৩। দুঃখী।

গৌড় সারং—তেতালা।

তোমার লাগি আছি জাগিয়া
দিবা নিশি
একা বসি
আকুল হিয়া।

যেও না ছেড়ে নাথ
দুখী বলে মোরে ;
পূজিব সকল
হৃদয় দিয়া ॥

২৫। কর্ণধার।

(কুড়ানো গানের অনুকরণে)

ভৈরবী—একতালা।

সংসারের তুফান দেখে
ভয় কোরো না যাত্রীজনা।
হোক না কেন জীর্ণতরী—
কর্ণধারের গুণ জান না।

তাঁহারে বলে অরূপ কালো ;
তাঁহার এই কালো রূপ চিরকাল-
যার লাগে নয়নে ভালো
দেয় সে প্রেতে আসন সোনা।

তাঁহার নাম কৃপাকর নাবিক
সকল ঘাটে তাঁহার থানা।
তিনি অপার নদী পার করে দেন-
তাঁহার মত কেউ পারে না।

তিনি হে নাবিকের চূড়া ;
তিনি তাই নায়ের বসেন চূড়া' ।
তাপিত আর ভক্ত-চূড়া
তাঁহারে চেনে ঐ দুজনা ।

—ওঁ—

২৬। মন-হরা।

পূরবী—ধামার।

বীণা বাজাইয়া
মন হরিলে হে।
মধুর—মধুর ধ্বনি
গগন ছাইল রে—
অনাহত তানে
প্রাণ ভরি'
মন হরিলে হে।

২৭। আকুলতা।

বেহাগ—তেতালা।

পরাণ ছুটে তোমার পানে
দিবস রজনী
প্রিয়তম—
যেমন তটিনী
ধায় সিন্ধু পানে।
প্রাণনাথ হে
মোরে দেখা দাও—
আঁখিজলে
আকুল নয়ন।

—০—

২৮। স্বর্ণযুগ।

সে দিন আবার—আবার সেদিন
আসিবে—আবার আসিবে।

জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে মাথা উঁচু করে
ভারতের বীর—
আবার জাগিবে।
স্বাধীনতা সাম্য ভারতের প্রাণে
আবার—আবার—
ফুটিয়া উঠিবে।

সরলতা যাহা আছিল ভারতে—
কি সুন্দর আহা !—
পুন দিবে দেখা।
আপন গৌরবে দাঁড়াইব মোরা—
কে দিবে রে বাধা—
ধরি' জয়লেখা।

কোথা হিমাচল—কুমারিকা কোথা—
পরাণে পরাণে
ভারত আবার মিলিবে।
হিন্দু মুসলমান, কেবা রে খৃষ্টান—
সবাই সন্তান—
একই যে মায়ের—বুঝিবে।

এ মিলন তাল জমাট বাঁধিবে—
কোন দেশ আর
পারিবে না দাঁড়াতে কাছে ;-
এগোবে এ দেশ বিদ্যুতের বেগে
ধরমে করমে—
চিত্ত তাই নাচে রে—নাচে।

বিচ্ছেদের পর মিলিবে ভায়েরা ;
খুলে যাবে প্রাণ—
প্রেমের রবে নাকো সীমা।
হইবে দেবতা পরতে পরতে—
রবে নাকো ভেদ—
জাগাবে আপন মহিমা।

জাগিবে ভারতে নূতন মানুষ—
নিজ বলে বলী নূতন পুরুষ,
নূতন ভাবের নূতন মহিলা;
ভারতের যিনি চির ভগবান—
দেখাবেন তিনি নব নব লীলা।

দেহে বজ্র সম, প্রাণে ঢল ঢল,
প্রবল সাহসে, চরিত্রে অটল,
সুনম্র বিনয়ে, আকারে সুন্দর,
যুবক-যুবতী হাজার হাজার
জাগিয়া উঠিবে ধরমে সবল।

স্বর্ণযুগ লয়ে সোনার ভারত
দেখিও আবার জাগিবে।
ভারতে সেদিন দেব-ঋষি যত
একপ্রাণে মিলে খেলিবে॥

—ওঁ—

২১। বীণা।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বীণা তব শুনি' মোর পরাণ চাহে
যেতে ধেয়ে তব চরণে হে।
রাখে কেবা বাঁধি'
মোরে আজি মধু—
রাতে, কঠিন শত বাঁধনে হে॥

—ওঁ—

৩০। জীবনকথা।

সুঃ—পুঃ—

কেন গো বিরক্ত কর
মোরে বারবার ?
লিখিতে জীবনকথা
বলিও না আর।

কি হবে শুনিয়া বল
নিজ গুণগান—
নিজের রচিত—যাহে
নাহি সত্য-প্রাণ ?

কত-কি উঠে যে প্রাণে
পাপ-তাপব্যথা—
খুলে কি বলিতে পারি
সে সকল কথা ?

পারি যদি—তবে বলি
মানুষ আমায়;
তবে গো যাচিবে মোর
জীবনী-লেখায়।

তাহা যদি নাহি পারি—
সত্য বল তবে,
বড়াই কিসের করি
এ মহান ভবে—

প্রশংসাকাহিনী রচি—
মিথ্যা কথারাশি
জীবনকথার নামে
নিজেরে প্রকাশি'?

ছায়ারে নিজেরে আমি
আজিও না জানি ;
তবুও জীবনকথা
লিখিবারে মানি !

ধিক ধিক মুখ ঢাকি—
পিটাবো না ঢাক ;—
লিখেছি জীবনকথা—
করিব না জাঁক ।

ভাল কাজ করে যাব—
এঁকে দিব নাম
প্রতি ধূলিকণা-গায়ে—
প্রাণে পাব প্রাণ ।

শান্তি—

জীবনীর তরে ঢাক
পিটাতে আমার
হবে নাকো আপনারে—
জানি ইহা সার ;

হবে না ডাকিয়া কারে
লিখাতে বা আর
নিছক প্রশংসা নিজ
মিথ্যা ভারে-ভার ।

মিছা কেন ভাবি আমি—
ধরাবাসী যত
চিরকাল তরে রবে
শুনিবারে রত

আমারি প্রশংসাগাথা
অন্য সবে ছাড়ি'—
মিথ্যা যত বাজে কথা
ধরিবে আঁকাড়ি' ?

সকলেরই কাজ আছে—
ছোট বড় কিবা
আপনার সীমা-মাঝে,
যথা নিশা দিবা ;

সকলেই বড় জানি
নিজ নিজ কাজে ;
নাহি মানি ছোট কারে
এ ভবের মাঝে ।

ধূলিও তো কম নহে
গরিমাতে আপন—
নিজ মনে করে মহা
কর্ম্মের সাধন।

চোখের দেয় সে দৃষ্টি—
পার দিতে তুমি ?
তবুও সে সকলের
চরণেরে চুমি'

রহিবারে বাসে ভাল ;—
ঘোষিতে চাহে না
আপন বিজয়গীতি ;
আপন জীবনস্মৃতি
লিখিতে চাহে না।

—ওঁ—

৩১। জয় দেবদেব ।

খাম্বাজ—তেতালা ।

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী

নিস্তার প্রভো—

জয় দেবদেব !

আকুল প্রাণে আমারি

ভকত-চিত-বিহারী !

দেখা দাও

ভিক্ষা মাগি—

জয় দেবদেব !

পিপাসিত-চিত-বারি !

ত্রিলোকজগতধারি !

দীননাথ

দয়াসিন্ধু

জয় দেবদেব !

শান্তি—

ওহে সংসারকাণ্ডারী!

আশ্রিতভয়হারী!

ভবপারে

যাও লয়ে—

জয় দেবদেব!

—ওঁ—

৩২। কি যে গান!

বেহাগ—রূপকড়া

কি যে গান
শুনিলাম!
হিয়ার মাঝারে
আনন্দ-ঝঙ্কারে!

নীরব নিশীথে
সব-অলথিতে
শিশিরনীরে
আসিয়া ধীরে,
শোনাও গানে—
পাগল প্রাণে,
মোহিয়া লওহে
ভবের পারে।"

শান্তি -

গ্রহের সাথে
জোছনা রাতে
বেড়াব ঘুরে
হৃদয় পূরে—
বাতাসে খোলা
পরাণ ভোলা—
অসীম নীল
আকাশ-পরে ;

আনন্দসাগরে
ডুবি' চিরতরে
পূজিব গোপনে
তোমারি চরণে ;
জীবন যৌবন—
সোনার বরণ—
উঠিবে ফুটিয়া
মরম-মাঝারে ॥

—ওঁ—

৩৩। ছেড়ো না।

আশাবরী—ঝাঁপতাল।

বিপদনাশন !

মরম-বেদন

না বুঝিলে প্রভু !

বাঁচি হে কেমনে ?

প্রভু ! তোমা ছাড়ি'

কে আছে আমারি ?—

কেহ নাই—

কেহ নাই—

যারে, বলিব আপনে।

তোমারি চরণ

লয়েছি শরণ ;—

জীবন-পরশে

মরুক মরণে।

শান্তি—

হৃদয়-আসনে

পেতেছি যতনে ;

ছেড়ো না—

ছেড়ো না—

মোরে, বড় দুখীজনে

—ওঁ—

৩৪। ঝড়।

রাজধানী কলিকাতা হতে
পাল তুলে নৌকা দিনু ছেড়ে—
ত্রিবেণীতে লাগিবে যাইয়া ;
ঝড় উঠিল পশ্চিমে তেড়ে॥

হে মাঝি ! নোঙ্গর দাও ফেলে ;—
দেখিছ না নৃত্য প্রলয়ের
করিতে করিতে আসিতেছে
ঘনঘোর সারি জলদের ?

উড়ে যেতে হয়—যাব উড়ে
মেঘ-সাথে হয়ে একাকার
জীবনে মরণে খেলে যেথা—
খেলে যেথা আলোকে আঁধার।

নির্জীব কিন্তু রহিতে পড়ে
পারিব না কভু চুপ ক'রে ;—
জীবনের সাথে খেলা ক'রে—
শতবার ভাসে—যাই ম'রে।

এই-মত ঝড় ভালবাসি—
সকলের প্রাণে পড়ে সাড়া ;
সবল মানুষ থাকে যারা,
তা'রা সব হ'য়ে যায় খাড়া ;

দুর্ব্বল যেথায় থাকে যে বা—
ভয়ে যারা হয়ে যায় সারা—
চলে যাক্—শীঘ্র যাক্ সরে ;
ঠাঁই নাহি কারো হেথা, যারা

মরণ আসিতে-না-আসিতে
মরণেরে করেছে বরণ,—
দেখে নাকো ঝড়ের ভিতর
খেলে এক মহান জীবন।

—০—

৩৫। বরপ্রার্থনা।

মূলতান—আড়াঠেকা।

দিবানিশি পথ চাহি
জাগি নাথ হে।
পদ তোমারি
চিতে সদা ধরি'
প্রেমফুলে পূজি—বর
মাগি নাথ হে।

—ওঁ—

৩৬। জাগরণগীত।

শত যুগ পরে মধ্য পথে
ভারতের মহাপ্রাণ হতে
মহাগান এক উঠেছে জাগিয়া ;
প্রভাতের প্রথম আলোকে
নিদ্রালস্য ভাঙ্গিয়া কুহকে
জাগরণগীত উঠেছে বাজিয়া।

জেগে ওঠ—ঘুমায়ো না আর ;-
দীক্ষা লও আগুন খাবার
মিলনের মহামন্ত্রে স্নান করি' ;
মিলে-জুলে করে যাও কাজ—
হার-জিতে হবেনাকো লাজ—
মহামন্ত্র এই প্রাণে লও ভরি'।

শান্তি—

জমীদার প্রজা কেবা কোথা—
বুঝি' লয়ে কার কিসে ব্যথা,
প্রেমের বাঁধনে বাঁধ গো সবারে।
শুনো না শুনো না কারো কথা—
বাস্তুভিটাহীন যারা সদা—
প্রাণের বাঁধন চাহে টুটিবারে।

আর না—আর না—বহায়ো না
রুধিরের স্রোত; আনিও না
বিবাদ বিচ্ছেদ যতেক অপ্রেম।
তাহে শুধু জানিও নিশ্চয়
হবে ঘোর শক্তি-অপচয়—
হবে না কল্যাণ, দূরে যাবে ক্ষেম।

জমীদার প্রজা শুধু কেন ?
কতবিধ লোক আছে জেনো—
সকলেরি প্রাণে দেখি জাগরণ ;—
এধারে ওধারে চারিধারে
ক্ষেত্রমাঝে নদীর কিনারে
ঢালা দেখি প্রাণ যুগের নূতন ।

কলকারখানা শত শত—
মজুর না জানি খাটে কত—
দেখিতে পাও না তাহে কি গো তুমি
শ্রমজীবী সকলের মাঝে
স্বরগের বাণী লয়ে আছে
মহাজাগরণ—মিলনের ভূমি ?

আমি তাহে পাই শুনিবারে—
ধ্বনি-পরে ধ্বনি আসিবারে—
মহাজাগরণ মিলনের গীত ;—
ছুতার কামার কিবা রাজ
যেখানে যে করে যত কাজ—
সকলেতে গাঁথা জাগরণ-হিত।

দাঁড়ি যবে একমনে গেয়ে
তালে-তালে তরী যায় বেয়ে,
দাঁড় ফেলে অবিশ্রাম ঝপাঝপ ;
সবল পেশল যুটে যত
একমনে ফেলে অবিরত
ধান্যবস্তা পরে-পরে ধপাধপ ;—

তাদের সেই তালের মাঝে,
তাদের সেই কর্ম্মের মাঝে,
জাগরণ-গীত শুনি বাজে সদা।
ঘুচে যায় সেই জাগরণে—
মুছে যায় মহান মিলনে—
ছোটখাটো ভেদ—মনের পরদা।

গাও তবে গাও প্রাণ খুলে,
ভেদাভেদ ভেঙ্গে দিয়ে মূলে—
আমার বুকের বুকচেরা ধন!
অনন্ত জাগরণের গান—
মিলনের—উন্নতির—প্রাণ—,
গাও মন খুলে—গাও অনুখন।

—ওঁ—

৩৭। ব্রহ্মসভার হাসপাতাল।

(কুড়ানো গানের অনুকরণে)

ভৈরবী—একতালা।

তোরা আয় কে যাবি রে
ব্রহ্মসভার হাসপাতালে
কলকেতা সহরে।
আর কেন ভাই যাতনা পাই
কলি-ম্যালেরিয়া জ্বরে রে ?

কখন এমন ছিল না—
দেখে জীবের যন্ত্রণা রে
কল্লেন এক দাতব্য ডাক্তারখানা
দীনহীনের তরে রে।

গাছগাছড়া বেদবিধি ;
আরক তুলে কল্লেন বিধি রে—
তারকব্রহ্ম মহৌষধি
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে রে।

ব্রহ্মসভার হাসপাতাল—

রাজা বাবু * সিবিল সার্জন ;

এসিষ্টাণ্ট দেবেন্দ্র † হন রে ;

নেটিব রামচন্দ্র ‡ আর কেশব §

আনন্দ ¶ যে কম্পাউণ্ডার রে।

রাজা বাবুর স্মরণ জোরে ;

কত শত রোগী ছিল রে—

তাদের বিষম জ্বর ছেড়ে গেল

একটী মিকশ্চারে ।

---

* রাজা রামমোহন রায়।

† মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‡ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

§ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

¶ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

পথ্য বলে দিচ্ছেন বাবু—
সাধুসঙ্গ দুগ্ধ সাবু রে;
ব্রহ্মনাম পাতি লেবু—
রুচি না হলেও অরুচি হরে রে।

গুরুজী আমার বলেন ভেবে—
অক্ষয় এই ঔষধ খেলে রে
জ্বর যেত তোর কপট পিলে—
যেত একেবারে॥

—ও—

৩৮। অনাবৃষ্টিতে।

সিন্ধুরখাদি মল্লার—তেওয়ালা।

জল্ দাও—জল প্রভু—যাচি হে।
তব দয়া বিনা কেমনে বাঁচি হে॥
দগধ হইয়া যায়
ধরার শ্যামল কায়;—
মরমদহন হায়
রোদন চরণে ধায়।
প্রভু দয়াল—করুণা কর—অন্ন দিয়ে
বাঁচাও হে সন্তানেরে॥

—ওঁ—

৩৯। বরষায়।

সিতারখানি মল্লার—তেতালা।

রিমঝিম্—বারিধারা বরষে।
আজি মন উঠে নাচিয়া হরষে॥
বহিছে পূরব বায়
ঝরে ঝর ঝরে জল;
আনন্দে শিহরে কায়—
প্রাণ মম চলচল;
ময়ূর ভোর—ময়ূরী নাচি—মেঘদল
চারিদিশি গরজে রে॥

আজি বাঁধিছে দোঁহায় দোঁহে
গগন ধরণী স্নেহে—
শ্যামল পুলক দেহে—
প্রেমের মধুর পরশে।

বলাকার সারি যায়
হেসে খল-খল-খল ;
ঝিঁঝিঁ শত গীত গায় ;
মকমকে ভেকদল।
কৃষাণ-বধূ আশীষ দেছে ;—শান্তিজল
শতধারে ঝরবে রে ॥

৪০। ছেড়ো না।

ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়ো না আমায়

হে মোর ভরসা

দেহ দেখা আমারে।

আছে আমার যাহা কিছু,

সকলি হে লও—শুধু

পদে রাখ আমারে॥

—ওঁ—

৪১। ব্রহ্মনাম ভুলো না।

(পুরাতন গানের অনুকরণে)

আমার ব্রহ্মনাম লওয়া হোল না ॥

মুখে ব্রহ্ম বলি, অন্য মনে করি—

প্রেমবারি চক্ষে ঝরে না ॥

ভগবান বলে দুটী বাহু তুলে

মনপ্রাণ কেন নাচে না।

কবে প্রেমরসে বেড়াইব ভেসে

তাঁরি রূপে হয়ে মগনা ॥

আমি মনে করি সকলি পাশরি'

জ্ঞানযোগে আছে ধারণা।

দশ ছয় ষোল তারা বাদী হোল-

ভুলাইতে করে ছলনা ॥

শুনেছি পুরাণে সাধুগণ স্থানে
ব্রহ্মনামের নাই তুলনা।
জীবের জন্মজন্মান্তরে সব পাপ হরে-
ডাকার মত ডাকে যে জনা॥

ক্ষিতীন্দ্রের মন না হোল আপন—
আত্মারামের মানা শোনো না।
ব্রহ্ম ইহকালে, ব্রহ্ম যাত্রাকালে
ব্রহ্ম বলতে যেন ভুলো না॥

—ওঁ—

৪২ ॥ আমার দেশ ॥

আমার দেশ—ওরে আমার দেশ—
ওরে আমার দেশ!
কি মিষ্ট নাম—ওরে কি মিষ্ট নাম—
ওরে কি মিষ্ট নাম!

নামটী নিলে থাকে না দুঃখক্লেশ—
ওরে থাকে না দুঃখক্লেশ!
পশিলে কানে সুধায় ভরে প্রাণ—
ওরে সুধায় ভরে প্রাণ!

—ওঁ—

৪৩। নব বরষা।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

সঘন বরষে আজি ঘন।

পবন পূরব বহে

শন শন স্বনে

দদ্দুর ডাকিছে মকমকা।

মেঘের গরজ শুনি

তরাসে কাঁপে চিত;

পরাণ আকুলিত

হয় যমুনারি!

দামিনীর ভাতি

খেলে অন্ধ রাতি—

কেমনে ঘাটপানে

যাই একা-একা॥

কাটিল মেঘ যত—
তারকা জ্বলে শত ;
আনন্দ উছসিত
হয় যমুনারি।

দুখ রাখি' দূরে
ঘাটে ঘাটে ফিরে
কত নর-নারী
বালক-বালিকা॥

—ॐ—

৪৪। মরণ-বঁধু।

(কীর্ত্তনী ঢপের সুর)

বাঁচিবে কি সখি অভাজন দুখী,
প্রেমকণা যদি নাহি লভে ?
মরম ফুটিয়া শত ধার দিয়া
শোণিতনিঝর শত ব'বে ॥

তাই যদি চাও খুলে বলি' দাও—
বারেক কথাটী না কহিব।
আপন মরমে আপন করমে
মরণেরে বঁধুয়া বরিব ॥

বিনা তব প্রেমে গীত গেছে থেমে
পরাণে বহিছে মরু-বায়।
মরিব বলিয়া আছি অপেখিয়া
ধেয়ানে ধরিয়া তব পায় ॥

স্বপ্ন-বঁধু—

নাহি ভাল বাস—নাহি ভাল বেসো-
বারেক তো যাও দেখা দিয়ে।
মরিব গো সুখে—রবে নাহি দুখে—
জ্বালা সব ছাড়ি' যাবে হিয়ে॥

—ওঁ—

৪৫। আত্মহারা।

সংসারের কলরব গিয়াছে থামিয়া।
নীরব হয়েছে ধরা—সুষুপ্তি ছাইয়া॥
বারেক ঘুরিয়া এস অবসর লয়ে।
হে মন! মুহূর্ত্ত আর থেকোনা ঘুমায়ে॥

আকাশের পরে আছে আকাশের স্তর।
চলে যাও সব ছাড়ি'—সবারি উপর॥
নিবিড় বহিছে সেথা আনন্দের ধারা।
বচন ফিরিয়া আসে আপনাতে হারা॥

জ্ঞানের গরব সেথা রহে নাকো আর।
সীমার বাঁধন নাহি—শোকদুঃখভার॥
আপনারে খুলে গাও আনন্দের গান।
আত্মহারা হও, লয়ে অসীমের প্রাণ॥

—ওঁ—

৪৬। অত্যাচারী।

কে আছ পাষণ্ড কোথা
 দুর্বলে করিতে দলন ?
জেনো আমি আছি সেথা
 তোমারে করিতে দমন ॥

অস্ত্র তব যত কিছু
 লাগিবে বুকেতে আমার ?
জাগো তুমি—ফিরে যাবে—
 আঘাত লাগিবে তোমার ॥

আমার মানসপুত্র—
 উঠিবে সৈন্য লক্ষ লক্ষ—
অমর সাহসী পটু
 সেনানী বীর যুদ্ধে দক্ষ ॥

শান্তি—

হুহুঙ্কারে ছুটে গিয়ে
করিবে ছিন্ন তব পক্ষ ।
সবেগে ঘিরিবে তোমা'—
বধিবে চিরি' তব বক্ষ ॥

বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংগ্রামকথা
শুনেছ নিশ্চয়—তাহা
সত্য—ধ্রুবতারা ঐ যথা ॥

আমারো এ সত্য কথা
দেখে নিও—হবে না মিথ্যা
অত্যাচার-যজ্ঞে উঠে
অত্যাচারী বধিতে কৃত্যা ॥

এখনো বলিছি—ছাড়
আঘাত দুর্বলের পরে।
পশুমন্ত্র ছেড়ে দাও
মনুষ্যত্ব বরণ করে॥

উঠে পড়—খাড়া হও—
নিজ শুভ কর্ম্মের বলে॥
ভগবানে চিত্ত রেখে
অমঙ্গলে চরণে দলে॥

—ওঁ—

৫৭। পথহারা।

(রামপ্রসাদী সুর)

সন্ধ্যা হয়ে মা এল যে হায়!
ঘরের পথে হারিয়ে বসে
কোথা যাব ভেবে না পাই! (ধুয়া)

সর্ব্ব অঙ্গ ধূলোয় ভরা—
কোলে নে মা শ্রান্তিহরা;
কোথা গেলি আমায় ফেলি'—
দেখা দিতে বারেক মা আয়।

আঁধার ঘন নেমে আসে—
প্রাণ যে কাঁপে ভয়ে ত্রাসে;
মা মা বলে ডাকছি কত—
সাড়া তবু দিতে কি নাই?

প্রদীপ-হাতে আলো দেখা—
আঁকাবাঁকা পথ কাঁটায় ঢাকা ;
ঘরে ফিরে তোর কোলে উঠে
আঁখিজলে তোর ভাসাতে চাই॥

—ওঁ—

৪৮। শিবিরে।

শিবির পড়েছে শত সাদা সাদা সাদা
শ্যামল সুন্দর মাঠে আকাশের তলে ॥
এসেছে ফিরিয়া ঘরে বাজনার তালে।
আমারি সংগ্রামসাথী বীর সেনাদলে ॥

আমিও তাদের সাথে যাত্রা করেছিনু,
আদেশ আসিল যবে—দীর্ঘ—দীর্ঘ পথ ॥
চরণ খসিয়া যায়—শ্রান্ত ক্লান্ত কায়।—
দিনের আলোক যবে নিভ-নিভ-প্রায়,

আদেশ আসিল তবে থামিবার তরে।—
যেমন শুনিনু কানে—কি বলিব আর—॥
কত বন্ধু সাথী সবে থলিঝুলি আর,
পড়িল বন্দুক লয়ে ঘুমাইয়া পথে ॥

কতেক বা খাড়া করে তাম্বু ছোট ছোট ;
আহার ব্যবস্থা করে উনান জ্বালায়ে ॥
শিবিরের চারি ধারে সঙ্গীন কাঁধেতে
কতেক দাঁড়ায়ে স্তব্ধ শব্দগুপ্তি ধ'রে ॥

যারে তারে নাহি দেবে শিবিরে আসিতে,
শব্দগুপ্তি যতক্ষণ কহিতে না পারে।
নিরাপদ মানি' সবে ঘুমায়ে পড়িল।
নিস্তব্ধ হইল সব—নাহি সাড়াশব্দ ॥

অরুণ উদিত যবে—বাজিয়া উঠিল
শতেক কাড়ানাকাড়া ;—উঠিয়া পড়িল
নববলে সৈন্য তাজা ;—ঘুম গেছে কেটে
রাত্রি প্রভাতে ;—আবার যেতে হবে শুনি

নূতন যুদ্ধের মাঝে। প্রহেলিকাসম,
শিবির যতেক ছিল, মুহূর্তের মাঝে,
কোথায় লুকাল তারা সেনাদলসহ।—
ধরণী রহিল পড়ে—উপরে আকাশ!

আমি শুধু প'ড়ে প'ড়ে ভাবিতেছি একা।—
ছিন্ন-ভিন্ন-অস্থি-চর্ম্ম রাশি রাশি দেহ
যুদ্ধক্ষেত্র ছেয়ে আছে ;—পেতেছি এখনো
বারুদের গন্ধ।—বীরবন্ধু সেনাদল
দেশের গৌরব তরে বলি দেছে প্রাণ।

হে ধরণী মাতঃ এই প্রাণ সঁপিবার
সুফল নাই কি কোন? আছে সত্য জানি।
দিও না বিনষ্ট হ'তে কণাটী রক্তের—
প্রবেশ করাও তাহা আপনার প্রাণে।

নদ নদী বৃক্ষ—সবার ভিতর দিয়ে
তাহাদের মহাপ্রাণ উঠুক ফুটিয়া ;
বাষ্প হয়ে নিজ দেশে আসুক বহিয়া ॥
স্বদেশের তৃণক্ষেত্র শতাব্দী ধরিয়া
সেই বাষ্পে নবপ্রাণে উঠিবে বাঁচিয়া ॥
সঞ্জীবিত ক'রে দেবে সঞ্জীবন মন্ত্রে
বীর সেনাদলে—মরণ মরিবে তায় ॥

* * *

জীবনে-মরণে দেখি মহা কোলাকুলি ।—
কোথা সৈন্য—কোথা মৃত্যু—সবি গেছি ভুলি'॥

৪৯। সদানন্দে।

ভৈরবী—চেতালা।

মোর প্রাণমন ভরি'
পূজিব তোমায়—
এস সজ্জিত সুন্দর
মনমন্দিরে হে!
পূজি প্রেমফুলে হে—
লও তাহে তুলে
শোক দুখ জ্বালা যাব
আনন্দে ভুলে ;—
সদানন্দ পিয়া
রহিব তোয়—
প্রাণ মন ভরি'
পূজিব তোমায়॥

৪০। জালিয়ানালা।

জালিয়ানালা! জালিয়ানালা!
কেন তব বুক্তকর ঊর্দ্ধে আছ তুলি' ?
কেন ম্লান বেশে শুষ্ক রুক্ষ কেশে
দাঁড়ায়ে রয়েছ কোণে দীর্ঘশ্বাস ফেলি' ?

জালিয়ানালা! জালিয়ানালা!
কেন ঝরে অশ্রু তব তপ্ত অগ্নিসম ?
ভগ্ন দগ্ধ হিয়ে কিসেরি লাগিয়ে
বরিতেছ মরণেরে আজি প্রিয়তম ?

জালিয়ানালা! জালিয়ানালা!
কিসের যাতনা ভেঙ্গে দেছে তব বুক ?
অতীতের কোন্ শোকদুঃখগাথা
জনমের মত কাড়িয়া লয়েছে সুখ ?

শান্তি—

জালিয়ানালা ! জালিয়ানালা !
বুঝেছি—বুঝেছি, কোন্ দুঃখ জাগে আজ ;
হাজার হাজার বুকচেরা ধন
নিহত সম্মুখে হানিয়াছে বুকে বাজ ?

জালিয়ানালা ! জালিয়ানালা !
মুছ অশ্রুধারা—দিওনাকো অভিশাপ।
তাদের মরণে পড়ে গেছে সাড়া
সারা দেশমাঝে—জেগেছে প্রাণের ছাব !

জালিয়ানালা ! জালিয়ানালা !
করিও নির্ভর মহান দেবতাপরে ;
সুবিচার জেনো হবে গো নিশ্চয়—
জাগিবে এদেশ—জীবন লভিবে মরে।



৮৩। ডাক মন।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

তাঁহারে আজিকে ডাক মন!
ভকত সভারি মাঝে
শত ধারে ঝরে
আশীষ তাঁহারি—দুখ হরে।

গরজি' উঠিছে হিয়ে
অভয় তাঁর বাণী
সকল নাশি' হানি

নাথ নাথ বলি'
শোকতাপ ভুলি'
তাঁর পদ ধরি'
রও চিরতরে।

আনন্দ উছলিছে—
ধরিয়া কেবা রাখে—;
শোন গো শোন ডাকে
ওই জয়ভেরী।

জয়-রব করি'
এসো ছুটে চলি';
পাছে পড়ে নাহি
রও পথপরে॥

৫২। ঋণ।

(রামপ্রসাদী সুর)

ঋণজালে মা ডুবে আছি। (ধুয়া)

ঋণের কথা ভেবে ভেবে
প্রাণের ভিতর উঠি কেঁপে ;—
তোরে ওমা মিনতি করি—
খুলে দে মোর গলার কাছি ॥

অহঙ্কারের পেয়েছি ফল ;
এখন আমায় তুলে মা ধর—
ঋণের বোঝা নামিয়ে দিয়ে
পায়ে রাখ মা ভিক্ষে যাচি ॥

ভাঁড়ার তোর মা পোরা ধনে ;
তবু কি মা ক'রে মনে
হাতে গন্ধ করিস নিতি
আমায় মত মেয়ে মাছি ॥

—ওঁ—

৫০। সন্ধ্যায়।

(গদ্য-পদ্য)

সাগরের পরপারে
দক্ষিণ-পশ্চিম ধারে
ভানু গেল অস্তাচলে
সুন্দর রঙ্গিন বেশে
কে জানে কাহার দেশে—
অজানা অ-বাসধাম !

মনে হয় চলে যাই—
সশরীরে উড়ে যাই
নিস্তব্ধ মেলিয়া পাখা
কারেও না দিয়ে দেখা ;
নিজের আনন্দ নিজে
ভোগ করি আনন্দেতে।

সন্ধ্যায়—

যেও না যেও না তুমি !
বারেক দাঁড়াও হোথা !
তোমায় বাতাস খেয়ে
প্রাণের স্পন্দন পেয়ে
তড়িত প্রকাশে বুকে ;
হয়ে যাই মাতোয়ারা—
জোয়ার উথলে প্রাণে ।

প্রতি গাছে প্রতি পাতা
তোমারি আকাশতলে
তোমারি বাতাস সাথে
গ্রীবাভঙ্গে খেলে যবে ;
সাগরের ঢেউ যবে
জননী ধরণী-কোলে
আছাড়ি-পাছাড়ি পড়ে ;
তোমারি মহিমা তবে
হৃদয়ে জাগিয়া উঠি'
নির্ব্বাক করে গো মোরে !

শান্তি—

কোন্—কোন্—আদিকালে
তোমারি খসিয়া বিন্দু
আশ্চর্য্য জনম দিল
এ বিশ্বভুবনে সারা ;
যত কিছু প্রাণ গান
আনন্দ দিতেছে আজ,
সকলি তো আসিয়াছে
তোমারি সে বিন্দু হতে !

নির্ব্বাক হইনু আমি—
নতশিরে সিন্ধুতীরে
নীরবে প্রণমি তোমা।

* * *

ভকতি-কুসুমগুলি
আদরেতে লহ তুলি' ॥

—ওঁ—

৫৪। এস হে।

ভৈরবী—একতালা।

সুন্দর নব বসন্তপ্রাতে

তোমারি পরশ প্রাণ চাহে॥ (ধুয়া)

এস হে—এস হে!

এস হে—এস হে!

মরম-আসনে যতনে বসি'

প্রেমের বাঁধনে বেঁধে নাও হে।

চারি দিশি ভরি' উঠেছে গান,—

বাহিরিতে চাহে আকুল প্রাণ,

গগন বিমল হরিতে ভেদিয়া

রহিতে তব পদছায়ে—

এস হে—এস হে!

গাহি—

আজি ফুলে ফুলে দশদিশি
ফুটিয়া উঠিছে শোভা-হাসি—
যতই দেখি তত ডুবি হে!
এস হে—এস হে!

মলয় মধুর বহিয়া যায়,
প্রেমের কূজন গাহিয়া যায়;
পরাণ আকুলি-ব্যাকুলি' উঠিয়া
তোমারে আরো আরো চাহে-
এস হে—এস হে!

৫৫। ঋষি নরোত্তম।

ঋষি নরোত্তম আজি
উঠেছে জাগিয়া।
সেই কথা ধরাধামে
যেতেছি ঘোষিয়া॥

ন্যায়ের বিজয়গীত
পশে তাই কাণে।
স্বাধীনতা উন্মাদনী
বাজে তাই প্রাণে॥

সবাই যে ডাকে সবে
ভাই ভাই ব'লে।
শত্রুমিত্র উচ্চ-নীচ
ভেদ গেছে চ'লে॥

শান্তি-

সরলতা প্রাণে ধরি'
চলে সোজা পথে।
দেশের সুনাম রাখি'
ধরে সত্য-পথে ॥

দেশের বিভাগ আর
রেখো না রেখো না।
বিহার উড়িষ্যা বঙ্গ
পৃথক ভেবো না ॥

মান্দ্রাজ বোম্বাই কোথা,
কোথা শিখভূমি !
কোথা গঙ্গা-উপকূলে
আর্য্যাবর্ত্তভূমি !

কোথারে রাজপুতানা !
মধ্যদেশ কোথা !
আপনার ভাই বলে
ডাক গো সবারে প্রাণে ;
তবে না শুনিবে দেশে
বিজয়-মঙ্গল বাজে ?
মন্ত্র কর দৃঢ় সখ্য—
মিলনেরে এক লক্ষ্য ;—
তবে না যাইবে ঘুচে
দুঃখদৈন্য-ব্যথা ?

* * *

তখন আর এক শ্রী
ফুটিবে সবার মুখে
আবালবৃদ্ধ সবার
আনন্দ খেলিবে বুকে ॥

শান্তি—

অটুট একতাবন্ধ
খুলিবে না আর কভু।
আশীষ দেছেন শিরে
বিশ্বভুবনের প্রভু ॥

উঠিবে জাগিয়া দেশে
নরনারী শত শত।
অক্ষত চরিত্র লয়ে
ধরমে করমে রত ॥

মায়ের সন্তান বীর
সাহসে অটল ধীর।
রূপে গুণে কি সুন্দর
নরোত্তম-বংশধর ॥

প্রণাম।

কল্যাণ—তেওরা।

ওঁ পিতা তুমি জ্ঞানদাতা হে।

নমি তোমা।

ছেড়োনাকো মোরে॥

সমগ্র, দেব! হে পিতা!

দুরিত মোর করি' দূর,

আশীষ তব বরিষ॥

নমি দেব শম্ভব শুভদাতা হে!

নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে!

নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে॥

গ্রন্থকারের হিতৈষণা গ্রন্থাবলী।

১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত) ১৩০০ সাল।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ ১৩০১

৩। অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ ১৩০২ সাল।

৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩০৩ (২য় সংস্করণ ৫০০) ১৩১৭ সাল।

৫। আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ১৩০৭ সাল

৬। অভিব্যক্তিবাদ ১৩০৯ সাল।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি ১৩১৬ সাল।

৮। আলাপ ১৩১৭ সাল।

৯। আঁখিজল ১৩১৭ সাল।

১০। শ্রীভগবৎ কথা (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩১৯ (২য় সংস্করণ ৫০০) ১৩২৫ সাল।

১১। ওঁ পিতানোঽসি ১৩২১ সাল।

১২। প্রাণের কথা (১ম সংস্করণ ৫০০) ১৩২২ (২য় সংস্করণ ৫০০) ১৩২৬ সাল।

১৩। আদি ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবনা (ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৪০ পৃঃ মূল্য ৵০ আনা) ১৩২২ সাল।

১৪। বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি ১৩২৩ সাল

১৫। শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা ১৩২৩ সাল।

১৬। মা ১৩২৪ সাল।

১৭। মায়ে-পোয়ে ১৩২৫ সাল।

১৮। তোমরা আর আমরা ১৩২৬ সাল।

১৯। স্বস্তিকা ১৩২৬ সাল।

* ২০। জর্ম্মণির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভি-ব্যক্তি ডিমাই ১৬ পেজী ৬১ পৃঃ, মূল্য ।০ আনা ১৩২৭ সাল।

২১। ওপারে ১৩২৮ সাল।

* ২২। আর্ট ও সাহিত্য (রায় বাহাদুর দীন-নাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত) রয়াল ১৬ পেজী ভাল বাঁধা ও ভাল কাগজ। ১৮/০+১৮৪ পৃঃ। মূল্য ১৲ এক টাকা ১৩২৯ সাল।

---

* চিহ্নিত গ্রন্থগুলি ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলি দুষ্প্রাপ্য।

গ্রন্থকারের কয়েকটী গ্রন্থের

অভিমতসূচী।

গ্রন্থের নাম।	পৃষ্ঠা।
* আলাপ	(৪), (৬), (১২)
* আঁখিজল	(৩), (৫)
ঈশ্বর ও মানব	(২৮)
* ওপারে	(২২), (২৫), (২৬), (২৭)
* ওঁ পিতা নোঽসি	(২), (৫), (৭)
জর্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি	(১৯), (২০), (২১), (২২)
* প্রাণের কথা	(৩), (৭), (১৩)
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ	(২৮)
* ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি	(৪), (৬), (১৩)
* মা	(১৪)
* মাতৃপূজা	(১৫)
* মায়ে-পোয়ে	(১৬)
* রাজা হরিশ্চন্দ্র	(৪), (৫), (১১)
* শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা	(২), (৫), (৯)
* শ্রীভগবৎকথা	(২), (৪), (৫), (৬), (৭), (১১)
* স্বস্তিকা	(১৮), (১৯)

---

* চিহ্নিত গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটী গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত।

[প্রাপ্তিস্থল—আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ৫৫ আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ ২০৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা]

কিছু দিন হইল কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার প্রণীত চারিখানি পুস্তক সমালোচনার্থ আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্রকায়—বিস্তৃত সমালোচনার স্থান নাই, সুতরাং অতি সংক্ষেপেই সমালোচনা করিতে হইল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদেশে বহুপ্রকারে সুপরিচিত। তিনি একাধারে দার্শনিক, সাহিত্যিক, তত্ত্বজ্ঞানী এবং নিগূঢ় ভাবের একনিষ্ঠ সাধক। আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক চারিখানির ভিতরে মানবজীবনের উদ্দেশ্য, বিকাশ এবং সফলতাকল্পে তাঁহার চিন্তাশীলতা, ভূয়োদর্শন, গভীর জ্ঞান, দার্শনিক জটিল তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যানিপুণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অধিকন্তু তাঁহার "প্রাণের কথা" নামক পুস্তকের ভিতরে ভগবানের সহিত তাঁহার বিবিধ ভাবের যে মধুর সম্পর্কের পরিচয় পাইলাম, তাহা অতীব মধুর। প্রেমময় তাঁহাকে দিনের দিন তাঁহার প্রেমে

মুগ্ধ—মাতোয়ারা—পাগল করিয়া তুলুন ইহাই প্রার্থনা করি।

১। শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা—১৫ পনরটী চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা ইহাতে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে ভারতের শিক্ষা কত প্রকারের ও কি ভাবের হইলে জীবনের যথার্থ বিকাশ হয়, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষিশিক্ষা যে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় শিক্ষা—এই পুস্তক পড়িলে তাহার উপলব্ধি সহজ হয়। এই পুস্তকখানি শিক্ষাবিভাগে শিক্ষার পন্থানির্দ্দেশ-কার্য্যে, পরিবারক্ষেত্রে পিতামাতার সন্তান-শিক্ষানুষ্ঠানে, স্কুলের শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদানব্যাপারে এক বিশেষ সহায় হইবে।

২। ওঁ পিতা নোঽসি—(তুমি আমাদের পিতা) এই পুস্তকখানিতে সৃষ্টির ভিতরে স্রষ্টার জ্ঞানশক্তি, পিতৃত্ব, পালনীশক্তি, প্রলয়শক্তি এবং মঙ্গলশক্তি যে নিহিত আছে, তাহাই দর্শনের অতি সরল কথায় ১০টি ভাবের ভিতর দিয়া অতি সুন্দরভাবে গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে জ্ঞান হয়, বিশ্বাস হয় এবং প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বলাভের পন্থায় উপস্থিত হওয়া যায়।

৩। শ্রীভগবৎকথা—গ্রন্থকার ছোট ছোট বালক-দিগকে পরিবারক্ষেত্রে অতি সরল কথায় ঈশ্বরের স্বরূপ—মনুষ্যং

জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং— এই সাতটি স্বরূপ যে অতি সরল সুন্দররূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বালকদিগকে ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বরের স্বরূপ শিক্ষাদানকল্পে বঙ্গীয় সমাজে এমন উপাদেয় গ্রন্থ আর নাই বলিলেই হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু পরিবারে এই গ্রন্থ ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

৪। প্রাণের কথা—ভগবানের সঙ্গে সাধক গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব প্রেমের পরিচয়—বিরহ, সংসার, ঈর্ষা, আত্ম-বিরাগ, যোগ ও আকাশবাণী প্রভৃতি ১৫টি উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে পিপাসু পাঠকচিত্ত ঐ সকল উচ্ছ্বসিত ভাবের সাধক হইতেই আকাঙ্ক্ষা করে। ব্রহ্মবাদী ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৩ সাল

We have received four books being reprints of some of the writings of Tattwanidhi Kshitindra Nath Tagore, a gentleman who is by no means a stranger to students of religious and critical literature in Bengali.

ANKHI-JAL—It is a collection of short poems which the writer had composed from time to time. These poems are of great spiritual value.

RAJA HARISH CHANDRA—the writer has given account of the great King as it may be gleaned from the Vedas and the Puranas.

BIBRITI—is a collection of the sermons preached or essays written by the author concerning Brahmo religion.

ALAPA—is a reproduction of the papers which were contributed by him to the pages of the Bengali Magazines on literary, philosophical, historical and didactic subjects. The four books before us furnish indubitable evidence of the author's cultured taste, literary attainments, and religious earnestness and form a valuable accession to the stock of Bengali literature.—Indian Mirror 2, 9, 13.

SRI BHAGAVAT-KATHA.—In this book, which is one of the latest of the author's, are put together short discourses in which the idea of the God-head is sought to be impressed on the juvenile mind at the earliest stage of its development. The discourses are put in the

simplest style possible and in a manner well calculated to be effective. Indian Mirror 4.10.13.

শ্রীভগবৎ-কথা, শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা, ও পিতা নোহসি—"ভাষা সরল * * * পুস্তক কয়েকখানিই সুলিখিত এবং পড়িবার যোগ্য। * * * বহিগুলির গুণের জন্য শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে হইয়াছে। এডু. গেজেট ২৩শে ভাদ্র ১৩২৩।

We have much pleasure in acknowledging receipt of the under-noticed five books in Bengali which embody some of the writings and speeches of Tattwa-nidhi Kshitindra Nath Tagore B.A., a cultured member of the Jorasanko branch of the Tagore family of Calcutta.

1. Ankhijal. This is a collection of short poems, 56 in number, which the auther composed from time to time. These "tears" are drops of spiritual pearls.

2. Raja Haris Chandra. This is an eminently readable monograph, based on Vedic and Pauranik legends, concerning the great

King whose love of truth had cost him his earthly all.

3. SRI BHAGAVAT KATHA. In this brochure the author has addressed himself to the difficult task of imparting an idea of God to such boys and girls as have not reached their "teens". The language of the book is admirably suited to the comprehension of those to whom it appeals.

4. ALAPA. In this volume have been reproduced the contributions which the author had made from time to time to the pages of various magazines on literary, philosophical, moral and religious subjects. The author has done well in giving them a permanent form as most of them are of more than passing interest.

5. BRAHMA DHARMER BIBRITI. This volume classifies and places together addresses delivered and the papers written by the author, on various occasions, on the basic principles of Brahma

Dharma and the part that it has played, and is destined to play, in moulding the religious thoughts of the present-day world.

The five books before us represent a mine of substantial thought through which runs a deep vein of spiritual earnestness. Their contents clearly reflect the many-sided activities of the house of which the author is so worthy a scion.—The Hindu Patriot—July 21, 1914.

শ্রীভগবৎকথা, প্রাণের কথা, ওঁ পিতা নোঽসি—তিনখানি ধর্ম্মপুস্তিকা।

'শ্রীভগবৎ-কথা' শিশুগণকে ঈশ্বরতত্ত্ব সহজ ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা। 'প্রাণের কথা'য় লেখকের ভগবানের সহিত প্রাণের কথোপকথন বিবৃত এবং 'ওঁ পিতা নোঽসি' গ্রন্থে জগতে অমঙ্গলের ভিতরও যে ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের—পিতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, এই বিষয় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

গ্রন্থগুলি পড়িলে ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী আস্তিক ভক্তের লেখা বলিয়া বেশ বুঝা যায়, সুতরাং যে সকল স্থানে কেবল ভাবপ্রস্ফুটনের চেষ্টা, সেই স্থলগুলি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু দার্শনিকের চক্ষে দেখিলে অনেক স্থলে

গ্রন্থের বিচারপ্রণালী আমাদের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বোধ হয় নাই। শিশুগণের জন্য লিখিত বলিয়া এইরূপ—বলিলে চলিবে না, কারণ গ্রন্থকারের অন্যরূপ দার্শনিক বিশ্বাস থাকিলে তিনি সেইগুলিকেই সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন ; কারণ, তাঁহার সেই বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় গ্রন্থমধ্যেই আছে। 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—এই বাক্যটীর কখনও স্থূল অর্থ, কখনও বা সূক্ষ্ম অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে গোল সহজে মেটে না। ভগবান্ বন্যা দিলেন—তাহাতে অনেকের প্রাণ গেল, অনেকের ক্ষতি হইল, কিন্তু মাটীতে পলি পড়িল, জগৎ ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া গেল—এ যুক্তিতে ভগবান্ মঙ্গলময় প্রমাণ হয় না। যাহারা ধনী, সুখে স্বচ্ছন্দে বিলাসে রহিয়াছে, তাহারা এইরূপ ভাবিয়া মঙ্গলবাদী হইতে পারে, কিন্তু যাহাদের নিষ্পেষণে এই তথাকথিত মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাদের মঙ্গলময়ে দৃঢ় বিশ্বাসের নিশ্চিত ও সুদৃঢ় যুক্তি কই? আমরা বলি, ওদিক দিয়া গেলে কিছু বুঝান যায় না। ঐ বিষয়ে বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদের যুক্তিগুলির মত সমীচীন যুক্তি জগতে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাই বলি, এই গ্রন্থগুলিতে প্রদর্শিত যুক্তিগুলিতে আস্তিক ঈশ্বরবিশ্বাসীর কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে নাস্তিককে আস্তিক করিবার মত যুক্তি নাই।

উদ্বোধন ১৩২৩ পৌষ।

শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষি-শিক্ষা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত ভূমিকাসহ।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে গ্রন্থকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক সমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়ে যাহাতে সামঞ্জস্যের সহিত উন্নতি হইতে পারে, এরূপ শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী। এই মূলতত্ত্বের সহিত কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রথম অবস্থায় এবং প্রধানতঃ কৃষিশিক্ষা ভারতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এই মতও প্রকাশ করিয়াছেন; এবং ব্রহ্মচর্য্যকে শিক্ষার মূল ভিত্তি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর অনেক কুফলও দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিতে গেলে বোধ হয়, কতকগুলি আদর্শ শিক্ষক-গঠনই শিক্ষাবিষয়ক প্রধান সমস্যা। উপযুক্ত কতকগুলি শিক্ষক গঠন করিতে পারিলে তাঁহাদের আদর্শে ও তত্ত্বাবধারণে পরিচালিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে অনায়াসে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন। গ্রন্থ-কারের ন্যায় আমরাও বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিশেষ পক্ষপাতী, তবে এই ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উপায় যথার্থ সাধনসম্পন্ন ধার্ম্মিক শিক্ষকের জীবন-দৃষ্টান্ত।৹ ব্যায়াম-শিক্ষা

সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যে সকল কার্য্য আমাদের শারীরিক শ্রমসাধ্য অথচ প্রয়োজনীয়, সেইগুলি কেবল দাসদাসীদের দ্বারা না করাইয়া বালকগণকে সেইগুলি সম্ভবমত করিতে উৎসাহিত করিলে অর্থপরিচালনাও হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অল্পবয়স হইতেই আত্মনির্ভরশীল ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে। মোট কথা, স্বার্থত্যাগ ও বিলাসিতা বিসর্জ্জন, ইহাই সকল শিক্ষার ভিত্তি। প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষার ইহাই মূলমন্ত্র ছিল। এখন ঐ মূলতত্ত্ব বর্ত্তমান দেশকালপাত্রের সম্ভবমত উপযোগী করিয়া প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলে সুফল ফলিতে পারে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক গ্রন্থখানিতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে—এবিষয়ে গ্রন্থকারের নিকট হইতে আরও বিস্তৃত আলোচনার আশা করি। অন্যান্য সুধীগণও ঐ বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইলে দেশের কল্যাণ হয়।

উদ্বোধন—পৌষ ১৩২৩।

(1) "SRI BHAGOBAT KOTHA" (2) "RAJA HARISH CHANDRA," (3) "ALAP" and (4) "BRAHMODHARMER BIBRITI" by Tattwanidhi Kshitindra Nath Tagore B-A. Babu Kshitindra Nath Tagore is a Bengalee scholar. His writings evince a masterly command over the Bengalee

language, Hindu theology and the principles of Brahmo religion.

SRI BHAGOVAT KOTHA—is written in homely Bengalee. The style, method of treatment of the subject and the illustrations are quite suitable for the young boys to understand the omnipresence, omniscience and all-powerfulness of God. The book is fit for study in the Primary Schools as it is non-sectarian from beginning to end.

RAJA HARISH CHANDRA—displays a vast amount of the auther's knowledge and research in Hindu Sastras. It is a critical and historical account of Raja Harish Chandra, a popular Pouranic character. He traces the history of Raja Harish Chandra from the Rig Veda period down to the Pouranic period and points out the changes that the true account of Raja Harish Chandra has undergone at the hands of different writers in different periods.

ALAP—It is a collection of essays written by the author since his younger days. They are written in polished Bengalee and treat various subjects, social, religious and biographical. The life of Raja Rammohan Roy contains many useful informations. His discourse on Brahmo religion is very thoughtful and, though one may not see eye to eye with him on all points, it shows that he has been taking a great interest in the propagation of theistic principles. But we must confess we do not see the utility of quoting the extract on "Devotion" from the Christian paper 'Ephiphany' at the end of the book. It contains under a lot of platitude much of the narrow and bigoted sophistry that characterises the handling of Hindu problems by the average missionary, and, as such, should not have found a place in a book like this. Barring this flaw, we think we can on the whole recommend that such books should be widely read by the

public and should find a place in all public libraries.

"BRAHMO DHARMER BIBRITI"—is an exposition of the inner principles of Brahmo religion. It contains a series of sermons addressed to the members of the Brahmo Samaj. Although dealing with the cult of a particular sect, the book may furnish food for serious reflection to deep thinkers and advanced students of theology. The author is well-versed in the Upanishads. These sermons embody the principles as laid down in the Vedas and Upanishads. Amrita Bazar Patrika 31. 7. 13.

প্রাণের কথা—গ্রন্থকার সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তিনি প্রাণের আবেগে এই পুস্তকখানি জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন,—ভূমিকায় গ্রন্থকার প্রকৃত প্রাণের কথাই খুলিয়া বলিয়াছেন—"এই গ্রন্থ পড়ে কেহ যেন ভুল ধারণা মনে পুষে না রাখেন যে গ্রন্থকার ভগবানকে পেয়েছেন, জীবন্মুক্ত হয়েছেন। ...... ঈশ্বর যাঁকে ইহা গ্রহণ করাবেন না, আমার কাছেও তাঁকে ইহা গ্রহণ করাবার প্রয়োজন নাই"। ভগবানের সহিত জীবের নিত্যলীলা বিশ্লেষণে প্রাণের

কথায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার আর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী; পরন্তু পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে মানবহৃদয়ে ভগবৎপ্রীতি প্রেম ও ভক্তি-ভাব জাগাইয়া তুলে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বস্তুতই মুগ্ধ হইয়াছি। জন্মভূমি ১৩২২ সাল চৈত্র।

"মা"—গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—তোমার 'প্রসাদী' বইটা আমার এত ভাল লেগেছে বলতে পারি নে। এত সরল ও প্রাণস্পর্শী হয়েছে যে, অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। সত্যি খুব ভাল।

কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় লিখিতেছেন—"আপনার প্রণীত "মা" গীতাবলীখানি পাই-লাম। ৺ব্রতীন্দ্রের ছবিখানি দেখিয়া এবং তদুদ্দেশ্যে যে গীতটী আছে পড়িয়া প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল, এমন কি চক্ষুর জল রাখিতে পারিলাম না। ছেলেটী কে তাহা বুঝি-য়াছি এবং উৎসর্গেও তাহা জানিতে পারিলাম। কয়েকটী গান কাল রাত্রিতেই পড়িয়াছি। যত পড়ি ততই আনন্দিত হই। কি সুন্দর স্তব ও উপদেশ।" ইতি—১৫।১১।১৯

শ্রীভগবানকে মাতৃভাবে দর্শন করিয়া রামপ্রসাদী সুরে ৬৯টী ভক্তিপূর্ণ গীত। আমাদের ভাল লাগিয়াছে। নমুনাস্বরূপ তিনটী উদ্ধৃত করিতেছি:—(১) "ভাত খেতে

আর পাবনা কি ছুটো।" (২) "করে যাব কাজ যা দিয়েছিস আমায়।" (৩) "মিলেছি মা তোর মধুর ডাকে।"

মাতৃপূজা—কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

যে দেবতা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিত আছেন সেই দেবতাকে বারম্বার নমস্কার করি।

(২) মা নামের ন্যায় মধুর নাম কোথায় পাওয়া যাইবে?

(৩) বেদমন্ত্রে প্রতিধ্বনিত গায়ত্রীমন্ত্রপূত এই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আমরা প্রতিবৎসর সম্মিলিত হই।

(৪) সন্তান ইচ্ছা করিলেই মাতার নিকট সোজা চলিয়া যাইতে পারে—সোজা মায়ের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে—মায়ের নিকটে সন্তানের যাইবার পথ অব্যাহতভাবে উন্মুক্ত।

এই অভিভাষণ আমাদের সুমিষ্ট লাগিবারই কথা। পূর্ণদর্শী ঋষিদিগের এবং অবতার পুরুষদিগের চরণরেণুতে পবিত্র ভারতমধ্যস্থ—রামপ্রসাদের এবং পরমহংসদেবের এবং শ্রীচৈতন্যের বাঙ্গালাদেশে ইহুদীয় সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামী কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। এডু. গেজেট, ২৪শে ফাল্গুন ১৩২৪ সাল।

মায়ে-পোয়ে—এই গদ্যকাব্যে মাতৃহারা সন্তান কোন্ পথে চলিয়া পুনরায় মাকে পাইতে পারেন, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা মধুবর্ষী—পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। অতি সরল ভাষায় ভক্তি এবং ভাবের সমাবেশে পূর্ণ—এখানি অতি উপাদেয় পুস্তক। আমরা পুস্তকখানিকে সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, পকেট সাইজ। অহরহ সঙ্গে রাখিবার মত পুস্তকও বটে। কাজের লোক মে ১৯১৯।

The booklet is composed of prose and poetical peices, containing the expressions of the son's heart laid bare before the Great Mother. There is no artificiality in or about it, no sign of midnight labour. We commend it to thoughtful men and women as a thought-provoking and helping book. Hindu Patriot 14 June 1919.

যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই, তার সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক পাতানো চলে। সাদার উপরে সব রঙই ফলানো যাইতে পারে। তাই সেই চিররহস্যময়ের সঙ্গে মানুষ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নানা সম্পর্ক স্থাপন করে।

উপনিষদ্ যাহাকে "বামনী" "ভামনী" ও "সংযদ্বাম"

কহিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে রস যখন বেশি জমায়েৎ হইয়া উঠে মানুষ তখনই তাঁহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ অনুভব করে। এই অনুভূতিটাকে বেশি করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে একটা সম্পর্কে পরিণত করে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সম্বন্ধটাকে মাতা-পুত্রের ভাবের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার "মায়ে-পোয়ে।"

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"মা লিখাইয়াছেন, আমি লিখিয়াছি।" এইখানেই তো কবিত্বের চরম এবং সমালোচনার শেষ! তাঁহার লেখনী সার্থক হউক।

ব্রাহ্মসমাজের ভিতর এমন কেহ থাকিতে পারেন, যাঁহার কাছে এই "মায়ে-পোয়ে" একটা সাকার উপাসনার চরম—অর্থাৎ প্রায় প্রতিমাপূজার কাছাকাছি বলিয়া মনে হইতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তির জন্য বলা যাইতে পারে যে তিনি যেন এই পুস্তকখানির "সন্ধ্যায়" পরিচ্ছেদটী মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন। যেখানে লেখক কহিয়াছেন—"মায়ের খোঁজে এসে যে এমন শোভা দেখতে পাব, তা কে জানতো? এত শোভা তো দেখ্‌ছি, কিন্তু মায়ের অরূপ রূপের যে শোভা দেখেছি তার কাছে এত শোভাও কিছুই নয়।" বৈদিক ঋষিগণ প্রথমতঃ সুন্দর জগতের যাহা কিছু মনোরম দেখিতে লাগিলেন, তাহাকেই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন "এই সেই!" দেখিতে দেখিতে অবশেষে উপলব্ধি করিলেন যে "নেদং

যদিদমুপাসতে" এই জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই চির-সুন্দরকে চিনিতে হইবে; এই জাগতিক ব্যক্তিগণের সহিত যত রকম সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে আনন্দময়ের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ। নতুবা সেই অচিন্ত্য অপার অগম্যকে কি করিয়া বুঝিবে?

এই "মায়ে-পোয়ে" ভাবের ধারার ভিতরে দেখিতে পাই "জ্বালা" আছে, "অভিমান" আছে, "আত্মসমর্পণ" আছে। অবশেষে সকল "আনন্দে" পর্য্যবসিত। সাধকের জীবন কত বিচিত্র ভাবের মধ্য দিয়াই না অগ্রসর হয়। ভাষা তাহাকে আর কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে?

যাহার জীবনে অরূপের রূপ-জ্যোতির সন্ধান মিলিল না—তার কিছু দেখাই হইল না। চিরসুন্দরকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে বলিয়াই জগৎ সুন্দর। যে ইহাকেই চরম ভাবিল, সে বড়ই ঠকিল। যে বালক খেলানা পাইয়া তাহাতেই মজিল, তাহার আর মায়ের কোল পাওয়া হইল কৈ?

স্তরপরম্পরাক্রমে উক্ত ভাবগুলিকে সরল ভাষায় ফুটাইয়া তোলাই এই পুস্তিকার বিশেষত্ব। এই মর্ম্মোত্থিত ভাবগুলি যেন সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত, সাধনার সাহচর্য্যে শুভ্রোজ্জ্বল, এবং অনুভূতির আবেগে কম্পিত—একখানি ক্ষুদ্র গদ্যকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন। নব্যভারত, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৭।

স্বস্তিকা—গ্রন্থকার সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে সোয়াস্তি

পাইবার উপায়স্বরূপে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। সরল ভাষায় আশা ও দৃঢ়নির্ভরের ভাব অনেক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে; অপর হৃদয়েরও ইহা কিছু 'সোয়াস্তি' দিবে।

তত্ত্বকৌমুদী—১৬ই বৈশাখ, ১৮৪২ শক।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি; কিন্তু ক্ষুদ্র হইলে কি হয়, ভাবে ও রসে অতুলন। ৮৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সব কবিতাই ধর্ম্মভাবমূলক। পড়িয়া সুখী হইলাম এবং ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম। পঞ্চপুষ্পের মধ্যে "ভারত-মাতা" কবিতাটী নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। নব্যভারত—চৈত্র ১৩২৬।

জার্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি—এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ক্ষিতীন্দ্র বাবু জার্ম্মণির উন্নতি প্রতিপত্তি ও পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিঃ গূষ নামক পাশ্চাত্য দার্শনিক "কণ্টেম্পোরারি রিভিউ" পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদ বেশ সুন্দর প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা সকলকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হিতবাদী ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ সাল।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম, এবং অনেক জিনিষ শিখিলাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জর্ম্মণীর মনীষিগণ তাঁহাদের দেশের রাষ্ট্রনীতিকে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা

এই পুস্তক পাঠে জানা যাইবে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির কি রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে হম্বোল্ড, ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, হেগেল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মত সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কারভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পণ্ডিত-দিগের চিন্তার ধারা বক্রগতি ধারণ করার ফলেই ইউরোপীয় মহাসমরটা সম্ভব হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি Gooch সাহেব লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন ;—"জার্ম্মণীর রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে এরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধ বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া এবং প্রবন্ধটি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলে সমরপক্ষপাতী লোকদিগের মতপরিবর্ত্তন হইতে পারে ভাবিয়া আমি অতীব যত্নসহকারে উহার অনুবাদ করিলাম।" অনুবাদের ভাষা ও ভঙ্গী সত্যসত্যই চমৎকার হইয়াছে। যাঁহারা নূতন স্বরাজ গড়িবার জন্য মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহারাও এই পুস্তক পড়িয়া নিশ্চয় উপকৃত হইবেন। সৎসঙ্গী—আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩২৮।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় রাজনীতিতত্ত্ব নাই বলিলেই চলে। সাহিত্যের দিক হইতে ইহার একটী বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অভাব পূরণার্থ শ্রদ্ধেয় ঠাকুর মহাশয় কণ্টেম্পরারী রিভিউ নামক পত্রিকা হইতে শ্রীমদ্ গূচের লিখিত একটী সুচিন্তিত রাজনীতিক প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা-

খানি রাজনীতিদর্শন বলিলেও চলে। ইহাতে ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজনীতিকগণের রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা ও বর্ত্তমান ইউরোপীয় শাসননীতির উদ্ভব, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের শাসনপদ্ধতির ফলাফল সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। যাঁহারা বহু মতের ভ্রান্তধারণায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন, তাঁহাদিগের পড়িবার অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। কায়স্থ-সমাজ—আষাঢ় ১৩২৮।

সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত গুষ (Mr, Gooch) Contemporary Review পত্রিকায় Evolution of German statecraft" নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ মহাসমরের সময় প্রকাশ করেন ; এইটি তাহার সুন্দর অনুবাদ। ইহাতে জর্ম্মণ রাষ্ট্রনীতির উৎপত্তি ও মহাসমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি প্রণালীতে তাহার অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহা সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি অল্প কথায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। অনুবাদকের ভাষার গুণে সুপাঠ্য। ক্যাণ্ট জোরের সহিত বলিয়াছেন ;—"মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেই স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়। আমাদিগের শক্তিসমূহ স্বাধীনভাবে ধীরতার সহিত ব্যবহারে আনিতে চাহিলে আমাদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত হইতে হইবে। এ বিষয়ের প্রথম চেষ্টার ফল স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ হইবে কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমরা ক্রমশঃ প্রকৃত পথ দেখিতে পাইব, কারণ ঈশ্বর মানবজাতিকে মুক্তিলাভের জন্যই সৃষ্ট

করিয়াছেন।'—এ উক্তির ফলাফলবিচার ভারতে আবশ্যক হইয়াছে; বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকা শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে চিন্তা করিবার মত অনেক তথ্যের সন্ধান পাইবেন। পরিচারিকা—আষাঢ় ১৩২৮।

অনুবাদক ক্ষিতি বাবু "নিবেদনে" লিখিতেছেন— * * *

ইহাতেই গ্রন্থের বিষয় প্রকটিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে এদেশের অনেক পত্র-সম্পাদকদের অকারণ ভীরুতার পরিচয়ও প্রকটিত হইয়াছে। প্রেস আইনই প্রধানত অনেক সম্পাদকের এইরূপ নৈতিক অধঃপতন ঘটাইয়াছে। এই উভয় বিষয় পাঠকগণকে দেখাইবার জন্যই ক্ষিতি বাবুর "নিবেদন" সমস্তটাই উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা জর্ম্মণীর বর্ত্তমান রাষ্ট্র-নীতির অভিব্যক্তি বুঝিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করুন। বঙ্গবাসী।

ওপারে—ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুলেখক শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার লিখিয়াছেন—"যে ছবি এঁকেচো সেটী অতি চমৎকার হয়েচে। আমার তো খুবই ভাল লেগেচে—বলতে পারি"।

ভাষার চারুত্বে ও প্রাঞ্জলতায়, বর্ণনার নৈপুণ্যে ও সরলতায় এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে ও পবিত্রতায় গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।

দেহবিমুক্ত জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহে চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক ও ব্রহ্ম-

লোক ভ্রমণ এবং ভ্রমণান্তে পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ ইহাই গ্রন্থের বিবৃত বিষয়। বিষয় আধ্যাত্মিক হইলেও দেশভ্রমণকাহিনীর ন্যায় গ্রন্থখানি আদ্যন্ত ঔপন্যাসিক বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ।

গ্রন্থনিবেদনে লেখক গ্রন্থের সত্য-মিথ্যার দায়ীত্ব যাত্রীর উপরেই অর্পণ করিয়াছেন। ভাবার দায়ীত্বও সম্পূর্ণ নিজে গ্রহণ করেন নাই। গ্রন্থের কতটা অংশ যাত্রীর অনুভূত এবং কতটা অংশ তাঁহার কল্পনাপ্রসূত, অর্থাৎ পাঠক কতটা অংশ সত্য এবং কতটা অংশ কল্পনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে কিছুই নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহাতে গ্রন্থের সমস্ত অংশের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি নিজেই যে সন্দিহান তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, "পরলোকযাত্রীর উক্তির সহিত উপনিষদের উক্তির মিল আছে, আবার নাইও। একটি প্রধান অমিল দেখি এই যে, উপনিষদে আছে চন্দ্রলোকের পর ব্রহ্মলোক; পরলোকযাত্রী বলেন সূর্য্যলোকের পর ব্রহ্মলোক।" কোন্ উপনিষদ হইতে লেখক এরূপ অমিল আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন; আমরা কিন্তু পরলোকযাত্রীর উক্তির সহিত উপনিষদের উত্তম মিল দেখিতে পাইলাম। অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে শিবিগোত্রীয় সত্যকাম পিপ্পলাদ-ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মনুষ্যগণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ওঁকার মাত্র ধ্যান করেন তবে এই কার্য্য দ্বারা তিনি কোন্ লোক জয় করেন। পিপ্প-

াদ্র-ঋষি তদুত্তরে বলিলেন যে ওঁকার মন্ত্রের একটি মাত্রা 'অ'কার) ধ্যান করিলে তল্লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীতে, দ্বিমাত্রা ('অ' 'উ') ধ্যান করিলে মনোলোকে (অন্তরীক্ষে), এবং ত্রিমাত্রা ('অ', 'উ', 'ম্') ধ্যান করিলে তেজোময় সূর্য্যালোকে গমন করা যায়। প্রথমতঃ ঋক্ মন্ত্রসকল সাধককে মনুষ্যলোকে উপনীত করে। দ্বিতীয়তঃ অন্তরীক্ষে যজুঃ কর্ত্তৃক সাধক সোমলোকে উন্নীত হন, এবং তৃতীয়তঃ সূর্য্যালোকে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সামমন্ত্রসমূহ কর্ত্তৃক সাধক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ওঁকার মন্ত্র সাধনে যে সাধক যত অগ্রসর হইবেন তিনি ততই ব্রহ্মলোকের নিকটবর্ত্তী হইবেন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ক্রমোন্নতির মধ্যে সূর্য্যালোকের অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মলোক। * * * পরলোকের বিবরণ পরলোকযাত্রীর অনুভূতই হউক অথবা উপনিষদের কয়েকটী সত্য অবলম্বনে কল্পিত রূপকই হউক, অথবা এতদুভয়ের অংশের সমষ্টিই হউক, যাত্রী পরলোক হইতে যে আনন্দের সংবাদ আনিয়াছেন, এবং নিরভিমান ও নিরহঙ্কার হইয়া পরোপকার ব্রত আচরণ করিলেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া এই আনন্দ উপভোগ করা যাইবে, এই যে আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহাতে মৃত্যুভয়ে অবসন্ন হৃদয় আশার সঞ্চারে অবশ্যই উৎফুল্ল হইবে।

পরলোকে আস্থাবান পাঠকগণ দর্শন ও উপনিষদের আত্ম-

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি ও তর্কের কূটজালে জড়িত হইয়া হাবুডুবু না খাইয়াও যে এই গ্রন্থে পরলোকের একখানা অনিন্দ্যসুন্দর চিত্রের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন তাহাতেই এই গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট সমধিক আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। গ্রন্থে অন্ততঃ যাত্রীর নাম ও পরিচয়ের উল্লেখ থাকিলে গ্রন্থের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইত ইহাই আমাদের বিশ্বাস। প্রতিভা—বৈশাখ ও আষাঢ় ১৩২৯;

We have read with not a little interest an anonymous brochure in Bengali named O-PARE, ("On the Other side") printed at the Adi Brahmo Samaj Press.It is written in an attractive style and professes to be a description of the other world given by one who left the earth and returned to it after a sojourn in that world. The description is throughout fanciful and allegorical, but the allegory is not explained, except incidentally here and there, in the language of spiritual experience, which would have made it more instructive than it is otherwise likely to be. The author sometimes quotes passages from the Upanishads, but does no

follow the Upanishadic description of the way to and the contents of Brahmaloka, though he speaks of it and of other Lokas. He might have consulted with profit the beautiful and edifying passage on the subject in the first chapter of the Kaushitaki Upanishad.

The Indian Messenger—15 January 1922

লেখকের নাম উল্লেখ নাই। ইহা একখানি আধ্যাত্মিক-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"কোন সুদূর পল্লীগ্রামে এক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি "পরলোকযাত্রী" বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। কিছু ঘনিষ্ঠতা হইবার পর তিনি আমার নিকট তাঁহার "পরলোকযাত্রার" কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে তিনি অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় নিজের শরীরকে ইহলোকে ফেলিয়া রাখিয়া লোকলোকান্তরে ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন, আগাগোড়া সমস্তই বর্ণনা করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। তিনি চলিয়া গেলে আমি সদ্য-সদ্য সেই বর্ণনাগুলি যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় লিখিয়া ফেলিলাম। গ্রন্থের সত্যমিথ্যা যাহা কিছু তাহা তাঁহারই।" ওপারের যাত্রী তাঁহার পরলোককাহিনীতে জটীল দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে যেরূপ সরল ও সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ

করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উপনিষদের সহিত গ্রন্থোল্লিখিত অনেক কথারই মিল আছে। তবে একটী প্রধান অমিল এই যে, উপনিষদে চন্দ্রলোকের পর ব্রহ্মলোক অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু "ওপারের" যাত্রী বলেন, সূর্য্যলোকের পর ব্রহ্মলোক। তারপর বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি লইয়া সত্যনির্দ্ধারণ করিতে গেলে চন্দ্রলোককে জীবনিবাসের অযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পরলোকযাত্রী চন্দ্রলোককে জীবনিবাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্বেত্তা ফ্লামারিয় মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষা চন্দ্রলোককেই জীবের বাসস্থানের পক্ষে অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সেই হিসাবে পরলোকযাত্রীর কথাগুলি বৈজ্ঞানিকের কষ্টিপাথরেও টিকিবে বলিয়া আমাদের মনে করা অসমীচীন নহে। এই গ্রন্থখানির ভাষা ও লিপিকৌশল এমনই চিত্তাকর্ষক যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। আমরা জনসাধারণকে পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উদ্বোধন।

আলোচ্য পুস্তকখানি আধ্যাত্মিক পুস্তকের মধ্যে গণ্য। লেখক তাঁর ভূমিকায় লিখ্ছেন, কোন "সুদূর পল্লীগ্রামে এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি "পরলোকযাত্রী" বলে নিজের পরিচয় দেন। কিছু ঘনিষ্ঠতা হবার পর তিনি আমার নিকট তাঁর পরলোকযাত্রার কথা বর্ণন করতে লাগ্লেন।

তনি কি প্রকার অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় নিজের শরীরকে হলোকে ফেলে রেখে লোকান্তর হতে ঘুরে এসেছিলেন, মস্তই বর্ণন করেন।" গ্রন্থের বর্ণনা সুন্দর—ভাষা বেশ—াড়তে আরম্ভ কল্লে ছাড়া যায় না। "ওপারে" পড়লে সত্য া কল্পনার কথা নিয়ে বিশেষ কিছু আসে যায় না—কিন্তু নে বেশ একটা সংসারবৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ভাব এঁকে দিতে পারে। "ওপারে" পড়ে তৃপ্তি লাভ কর্ত্তে পারা যায়।

কাজের লোক, সেপ্টেম্বর ১৯২২।

ঈশ্বর ও মানব; ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ;—প্রভৃতি আদি-ব্রাহ্মসমাজের ত্রিনবতিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক বিবৃত সন্দর্ভ আমরা পুস্তিকাকারে প্রাপ্ত হইয়া ও তাহা পাঠ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয় কেবল বিদ্বান ও শাস্ত্রীয় তত্ত্বের নিধি নহেন, তিনি একজন ভক্ত। ভক্তের উক্তি সমালোচ্য নহে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার। ভক্ত নিজেও ভগবানের উক্তি নানা ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুভূতি ভ্রাতৃগণকে শুনাইবার জন্য আনন্দে আত্মহারা হইয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "কান পাতিয়া শোন বিশ্বপতি পরম পিতার সাদর আহ্বান, ভুলিয়া যাও দুঃখ শোকের ব্যথা, ভুলিয়া যাও বিপদ আপদের কথা, উৎসবের আনন্দ-ধারায় আমাদের সকল ব্যথা সকল যন্ত্রণা ধৌত করিবার জন্য ভগবান

স্বয়ং উপস্থিত। ভগবানের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতম যোগ। যে অপরাজিত পরমপুরুষের শক্তিবলে আমাদের আত্মা ত্রিভুবনবিজয়ের শক্তি ধারণ করে তিনিই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও"।

আপনাকে পরীক্ষা কর। আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ধর্ম্ম সাধনের জন্য, পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের উদ্দেশ্যে স্বীকার করিতে হইবে তাহার প্রভাব। ভক্তের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে হইবে—

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।

ঠাকুরের পৌরোহিত্য সার্থক হোক্। তাঁহার প্রার্থনা স্পর্শ করুক হৃদয়ে হৃদয়ে। পরিচারিকা—বৈশাখ ১৩৩০।